প্রসঙ্গ রাষ্ট্রধর্ম

অনন্ত বিজয় দাশ

আমাদের এ পৃথিবীতে নাম জানা কিংবা না-জানা অনেক ধর্ম (Religion) রয়েছে। নাম জানাদের মধ্যে বেশি প্রচলিত হচ্ছে—ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, বাহাই, শিন্টো, শামানিস্ট ইত্যাদি। এই প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত ও আন্তর্জাতিক ধর্ম ছাড়াও (এদের শাখা-প্রশাখাসহ) বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের বেশ কিছু প্রকৃতিবাদী-পৌত্তলিক ধর্ম আছে। হিসেব করলে, বর্তমানে ছোট-খাট পঞ্চাশ-ষাটটি ছোট-বড় ধর্মসহ দশ-বারোটি আন্তর্জাতিক ধর্ম টিকে আছে। মানবসভ্যতার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আদিমসমাজ ব্যবস্থায় অনেক ধর্ম ছিল—যেগুলোর অস্তিত্ব এখন আর নেই। বর্তমানকালে অনেক ধর্ম ধুঁকে-ধুঁকে মৃত্যুর সাথে লড়ছে (বিলুপ্তির পথে), আর কিছু ধর্ম দিনদিন ফুলে ফেঁপে বলিষ্ঠ হচ্ছে; হয়ত, এগুলোও একদিন কালের গহ্বরে বিলীন হয়ে যাবে। অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

ধর্মের ইতিহাস আমাদের জানায়, প্রতিটি ধর্মই মানুষকে কেন্দ্র করে বিকশিত; ধর্মের-বাণী মানুষের স্বার্থ, লাভ-লোকসান, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি কেন্দ্র করে রচিত। তবে তা, (দুঃখজনক হলেও) পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য নয়। প্রতিটি ধর্মের বাণী নিজ নিজ ধর্মাবলম্বীদের অধিক সুবিধা প্রদান করেছে, গুণকীর্তন করেছে, পুরস্কার-প্রাপ্তির লোভ জাগিয়েছে, সাথে সাথে বিধর্মীর ধর্মাচরণের নিন্দা করেছে, সমালোচনা করেছে, বিধর্মীদের ভুল-ভ্রান্তিময় ধর্মীয়বাণী নিয়ে তীব্রভাবে শ্লেষ প্রকাশ করেছে, বিধর্মীকে ভয় দেখিয়েছে, কেউ কেউ আবার সুযোগ-সুবিধামতো বিধর্মীকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে (এরপরও এদের কেউ কেউ স্বঘোষিত "শান্তিবাদী" বিশেষণে ভুষিত; হাউ ফানি! গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল!)। প্রচলিত ধর্মের গ্রন্থগুলো পড়লে দেখা যায়—ধর্মগ্রন্থগুলো যতটুকু পুরুষের জন্যে, ততটুকু নারীর জন্য নয়। নিজস্ব ধর্মাবলম্বী নারীকেও মানুষ বলে ভাবতে অনেকের বুকে বেধেছে, বিধর্মী নারীতো কোন ছাড়! নারীকে অধস্তন করে রাখতে, সকল ধর্ম কম বেশি পারঙ্গম। নারীকে দলন-মর্দন করে ধর্মপ্রচারক নামের কামুক-ধূর্ত (রাজনীতিবিদ) পুরুষেরা কম-বেশি বিকৃত মৈথুনকালীন সুখ লাভ করেছে।

আধুনিককালের প্রতিটি ধর্মই নিজ নিজ ধর্মের মানুষকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা দিয়েছে; একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত এই দুনিয়ায় প্রাণীদের মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট জীব। আর এই মানুষ তাঁর কথিত সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের দাস। পাবলিকও তা বিশ্বাস করে। হায়! মানুষ আজো অজানা-অদেখা-ভ্রান্ত-অপ্রাকৃতের "গোলাম" হয়ে থাকতে এত আনন্দ পায়? গোস্বা করবেন না, কথায় আছে—"...(অমুক প্রাণির নাম উল্লেখ করলাম না) পেটে ঘি হজম হয় না।" তেমনি (মনে হয়) অধিকাংশ মানুষেরও স্বীয় স্বাধীনতা-ক্ষমতা-যোগ্যতা সহ্য হয় না। আফসোস! এখনো পশুবৃত্তি থেকে দাসবৃত্তির মধ্যে ঘুরা-ফেরা করছে—মানুষ হয়ে ওঠতে পারলো না।

পৃথিবীর নানা ধর্মগুলোর মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি কিছু ব্যাপারে মিল রয়েছে। যেমন—জগৎ সৃষ্টির কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে মেনে নেয়া, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ঈশ্বরকে স্বীকার করা, ঈশ্বরকে ভয় করা, শ্রদ্ধা করা, ধর্মীয় আচরণ পালন করা, কয়েকটি স্থানকে পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য করা ইত্যাদি। পাশাপাশি কোনো ধর্মই অন্য ধর্মের ঈশ্বর-দেবতা বাদে তার স্বধর্মের-ঈশ্বরের সমালোচনা করা, নিন্দা করা, ভুল ধরিয়ে দেয়া বা ভয় না করাকে কখনো প্রশ্রয় বা সুযোগ দেয়নি; বরঞ্চ এগুলির জন্য এই ইহজগতে এবং কল্পিত পরজগতে রয়েছে ভয়ানক শাস্তির বিধান। প্রতিটি ধর্মাবলম্বী মানুষই তার স্বধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে, স্বধর্মের কুসংস্কার, অযৌক্তিক ও বিজ্ঞানবিরোধী বক্তব্য মানতে অপারগ কিন্তু বিধর্মীর ধর্মাচরণের ব্যাপারে অহর্নিশ সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করে, বিধর্মীদের প্রতিটি ধর্মাচরণের বিশ্বাসযোগ্যতা খুঁজতে বিজ্ঞান-যুক্তির আশ্রয় নেয়। ভেরি ইন্টারেস্টিং!

ভয়-অজ্ঞানতা-অক্ষমতা থেকে হোক, ক্ষমতালোভী ধূর্ত-শঠ-প্রবঞ্চকের প্রতারণার কারণে হোক, ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসেবেই হোক, আমোদ-প্রমোদ করা জন্য আচার-অনুষ্ঠান পালন (সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে) করার জন্যই হোক অথবা অন্য যেকোনো কারণেই হোক, মানুষ কয়েক হাজার বছর ধরে ধর্মধারণ এবং ধর্মাচরণ পালন করে আসছে। সভ্যতার

নানা সময়ে স্থানিক-কালিক-গোষ্ঠিক পরিক্রমায় আবদ্ধ মানুষ নিজ নিজ ধর্ম দ্বারা পরিচিতি লাভ করেছে। নানা ভাবে শ্রেণিবিভক্ত এ সমাজে ধর্মকেও নিজেদের পরিচয়ের আরেকটি পরিচায়ক হিসেবে ব্যবহার করে নিজেকে গোষ্ঠিবদ্ধ করে ফেলেছে। পাঠকের হয়ত ভালো জানা আছে, আমাদের বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেকেই মুসলিম-এলাকা, হিন্দু-এলাকা হিসেবে আলাদা আলাদাভাবে অভিহিত করে থাকে। অনেক মানুষ নিজেকে তার নিজস্ব যোগ্যতা কিংবা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য দিয়ে পরিচিতি করানোর চাইতে ধর্ম দিয়ে (বংশ পরিচয়ের মতো) পরিচয় দিতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, গর্ববোধ করে। অনেককে দেখেছি, তাঁদের কাছে—ধর্ম এক মারাত্মক পবিত্র জিনিস, ধর্মানুভূতি চূড়ান্ত স্পর্শকাতর বিষয়; ধর্ম-ধর্মচর্চা-ঈশ্বরবিশ্বাস-উপাসনা পদ্ধতি ইত্যাদি আধোভৌতিক, অতিলৌকিক রহস্যময় কোনো কিছু। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান কিংবা নৃবিজ্ঞানের যে কোনো বই পাঠ করলে বোঝা যায়, ধর্ম আসলে ওরকম কিছুই নয়। মানুষই তার ধর্মের স্রষ্টা, মানুষই তার ঈশ্বর। অপার্থিবতা বলতে আসলে কিছুই নেই। ছোট্ট একটি উদাহরণ দেই, কোনো শিশুকে যদি জন্মের পর শুরু হওয়া সামাজিকীকরণের সময় ধর্মচর্চা শিখিয়ে না দেয়া হয় কিংবা উপাসনা করার রীতি-নীতি অর্জন করার জন্য নিকট আত্মীয়স্বজন-প্রতিবেশিসহ আশেপাশে ধর্মীয় কোনো পরিবেশই না পায়, তবে সেই শিশুটি বড় হয়ে অবশ্যই ধর্মহীন কিংবা ধর্মের প্রতি উদাসীন হবে। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ধর্মীয়বোধ কাজ করবে না। এ থেকে সহজেই বুঝা যায়, ধর্ম কোনো ঐশ্বরিক-অতিলৌকিক কিছু নয়, কোনো মানুষই জন্মের আগে ঈশ্বরের কাছ থেকে ধর্মীয় রীতি-নীতি, কিংবা ঈশ্বরবিশ্বাস নিয়ে আসে না। বরং বলা যায়, জন্মের পরই মানুষ তার আশেপাশের পরিবেশ থেকে ভাষা-আদব-কায়দা-আচরণ-জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি সামাজিক রীতি-নীতি অর্জনের মতোই ধর্মটা অর্জন করে থাকে, কিংবা বলা যায়, বুঝ হওয়ার আগেই ধর্ম-ঈশ্বর বিশ্বাসের মতো অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি-ভাবনা তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়; পরবর্তীতে যা থেকে মুক্ত হওয়া অনেকের কাছেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞান আমাদের দেখিয়েছে, প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার কাছে প্রাচীনকালের অসহায় মানুষ ভয়-ভীতিতে কাতর হয়ে, জ্ঞানের অভাবে, সময়ের প্রয়োজনে, স্বার্থের লোভে, নেতৃত্ব দেবার আকাঙ্ক্ষায়, মানুষই সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধর্ম তৈরি করেছে, গাঁথুনি দিয়েছে বিভিন্ন লোকাচার, নিয়ম আর প্রথার সারি; এবং পরবর্তীতে প্রতিটি শাসক শ্রেণী সর্বদাই তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসকে একটি প্রধান হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে এসেছে। আস্তে-আস্তে বিজ্ঞানের উন্মেষে-জ্ঞানের আলোয় এই লোকাচার-প্রথা আর পৌরাণিক গাঁথাগুলি সময়ের প্রয়োজনেই কুসংস্কারে পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে, তেমনি আজকের প্রতিষ্ঠিত, বহুল প্রচারিত ধর্মচিন্তাও সেদিকে মোড় নিবে; সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাহলে স্পষ্ট করে বলতে পারি, ধর্ম কোনো পবিত্র-অলৌকিক কিছু নয়, জাতভেদ, বর্ণভেদ, পিতৃতান্ত্রিকতার মতোই কৃত্রিম আদেশ-নিষেধের বেড়াজাল, তাই ধর্মানুভূতি নিয়ে অযথা স্পর্শকাতরতা কোনো সুস্থ-সঠিক আচরণ হতে পারে না। এখানে উল্লেখ করলে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না, মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের সেই অমর উক্তি: "অজ্ঞানতার অপর নাম ঈশ্বর। আমরা আমাদের অজ্ঞানতাকে স্বীকার করতে লজ্জা পাই এবং তার জন্য বেশ ভারী গোছের একটা নামের আড়ালে আত্মগোপন করি। সেই ভারী গোছের আড়ালটির নামই ঈশ্বর। ঈশ্বর বিশ্বাসের আরও একটি কারণ হল বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের অপারগতা ও অসহায়ত্ব।" (উৎস : রাহুল সাংকৃত্যায়ন, তোমার ক্ষয়, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৫।)

আলোচনার খাতিরে ধরে নিলাম, মানুষ যতই তার নিজের পরিচয় ধর্ম দ্বারা (তা যতই বিজ্ঞানবিরোধী, যুক্তিহীন হোক না কেন) উল্লেখ করতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে—কোনও রাষ্ট্রের ধর্মীয় পরিচয় ঘোষণা করা! বলা হয়, ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস ও উপাসনার একটি পদ্ধতি; যার সঙ্গে এক বা একাধিক অপার্থিব সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস (জানা মতে বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত), কতিপয় সদাচার বিষয়ক সংহিতা সম্পৃক্ত থাকে। পাশাপাশি এও বিশ্বাস করা হয়, এই (এক বা একাধিক) অপার্থিব পরম সত্তা ইহকালের জীবন-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রত্যেকের কর্মানুযায়ী পরকালে পুরস্কার ও শাস্তির বিধান দেবেন। তাই পরকালে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে পুরস্কার লাভের আশায় মানুষ ধর্ম পালন করে-ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—কোনও রাষ্ট্র কী সেই ভূমিকাতে অবতীর্ণ হতে পারে? রাষ্ট্র কী নামাজ পড়তে পারে, রোজা রাখতে পারে, পূজা-অর্চনা করতে পারে, চার্চে যেতে পারে? গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষের ধর্মীয় পরিচয় কোনো রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেয়া কতটুকু যৌক্তিক?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার দিকে তাকালে দেখি যে, কোনো দেশেই এখন আর একক ধর্মের লোক বাস করে না। সংস্কৃতির বিশ্বায়নের সাথে সাথে মানুষের বিশ্বায়ন ঘটে চলছে অবিরাম। বহু ধর্ম-বর্ণের মানুষ আজ প্রতিনিয়ত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে, এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হচ্ছে। কোনো দেশের সংস্কৃতি, আইনকানুন, রীতিনীতি, বর্ডার আজ আর কোনো সমস্যা নয়। বরং মানুষে মানুষে মিলন আজ মুখ্য। এরূপ বহুবর্ণের, বহুধর্মের, বহুজাতের, বহুগোত্রের বৈচিত্রে ভরপুর রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও কিছু দেশের সরকার তার দেশের ধর্মীয় পরিচয় ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট একটি বিশ্বাসের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছে। অথচ রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদানে কোন ধর্মীয় পরিচয় বা বিশ্বাস ধারণ কখনোই বিন্দুমাত্র আবশ্যিক নয়। আমরা প্রত্যেকেই জানি, একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য চারটি উপাদান রয়েছে। যথা : (১) জনগণ (২) ভূখণ্ড (৩) সরকার (৪) স্বাধীনতা। এই চারটি উপাদান মিলেই রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রের এক নম্বর উপাদান জনগণ। এই জনগণ কোন বিশ্বাস ধারণ করলো, কোন বিশ্বাস ধারণ করলো না, সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। আর বর্তমানকালে আমরা এও দেখি যে, এই জনগণ কখনোই একটি মাত্র গোষ্ঠির নয়, একটি মাত্র বিশ্বাসের অধিকারী নয়, একই চিন্তার ধারক নয়। বহু মতে, বহু পথে প্রতিটি রাষ্ট্রের জনগণই সহাবস্থান করছে নিজ নিজ রাষ্ট্রে আজকের প্রেক্ষাপটে। রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চলছে, আইন ভাঙলে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তারপরও কেন রাষ্ট্রের ধর্মীয় পরিচয় ঘোষণার এতো প্রয়োজনীয়তা? কারো কারো হয়তো মনে হতে পারে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যদি রাষ্ট্রধর্ম সমর্থন করে, তবে ক্ষতি কী? প্রশ্নটার মধ্যে একটা ভার-ভার ভাব আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরও কিছু দুর্বলতা আছে। আমরা দেখেছি, ধর্মের প্রশ্নে মানুষ যে কোন সময় অতি আবেগী হয়ে যায়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। জনগণ ধর্মীয় ভিত্তিতে (কিংবা আঞ্চলিকতাবাদে, বর্ণে) বিভক্ত হয়ে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকরা যদি দেশের স্বার্থে ভোট না দিয়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের/গোষ্ঠির স্বার্থে ভোট দেয়, তখন এই সুযোগে যে কোনো সাম্প্রদায়িক দল ক্ষমতায় চলে আসতে পারে, গণতন্ত্রের অপব্যবহার করতে পারে, প্রতিহিংসার আগুন বাড়িয়ে দিতে পারে; ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্তি চূড়ান্ত রূপ লাভ করতে পারে। উদাহরণ খোঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না, পাশের দেশ ভারতের অবস্থা দেখুন।

রাষ্ট্রধর্ম : ইতিহাসের পাতা থেকে :- রাষ্ট্রধর্মের ধারণাটি বেশ প্রাচীন। সভ্যতার গঠনকালিন সময়ে মানব সমাজের সংগঠন ছিল উপজাতীয় আর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভৌগলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এখনকার মতো তৎকালিন সময়ে রাষ্ট্রিয় সংগঠন বা রাজনৈতিক একক গড়ে ওঠেনি। উপজাতীয় প্রধানেরা বংশপরম্পরায় সমাজ নিয়ন্ত্রণ করত। ধর্ম ছিল টোটেম ও জাদুচর্চাভিত্তিক এবং অবশ্যই বর্তমানকালের মত এতো তাত্ত্বিকতা-উপাস্যআচরণ বর্জিত; ধর্মের প্রতিষ্ঠানিকরণও ঘটেনি। ক্রমশ আর্থিক বিকাশ, কৃষিভিত্তিক সভ্যতার অভ্যুদয়, শ্রম ও শ্রেণী বিভাজনের ফলে উপজাতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙন সৃষ্টি হয়। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র (কিংবা পরিবারতন্ত্র) টিকিয়ে রাখার স্বার্থে প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদেরও উদ্‌ভব ঘটে। বাণিজ্যের প্রয়োজনে, খাদ্য সংগ্রহের জন্য, উৎপাদন ব্যবস্থার উপকরণ সংগ্রহ কিংবা দাস সংগ্রহের জন্য উপজাতীয় শাসনব্যবস্থা ক্রমে বৃহত্তর ভৌগলিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র সামরিক শক্তি নির্ভর তীব্র স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠি ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা সবসময়ই ঝুঁকির মধ্যে থাকতো। ফলে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বৈরাচারী বংশানুক্রমিক শাসকগোষ্ঠী, তাদের মন্ত্রণাদাতা (বর্তমানের ঠাকুর-পুরোহিত-পাদ্রি-মোল্লা-মৌলভি ইত্যাদি), সুচতুর বুদ্ধিবাজ-ব্যবসায়ীদের (বর্তমানের বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়) সুকৌশলী অপতৎপরতায় প্রাচীন অসংগঠিত ধর্মবিশ্বাসকে ব্যাপক প্রচার-প্রপাগান্ডা দ্বারা জনগণের কাছে পল্লবিত-সংগঠিত আকারে উপস্থাপন করানো হয়। মূলত শাসকগোষ্ঠির তীব্র ক্ষমতালিপ্সাকে ন্যায্যতা প্রদানের জন্যই ধর্মশাস্ত্রের রচনা শুরু; তাই দেখা যায় শাসকশ্রেণির অনৈতিক স্বার্থকে জনগণের ক্রোধ থেকে সবসময়ই রক্ষা করে এসেছে ধর্মীয় বিধিবিধানগুলো। আর এজন্য শাসকগোষ্ঠির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতার ধারে-কাছে থাকা ধর্মগুলো দিনে দিন বড় হয়েছে, সংগঠিত হয়েছে, শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে তৎকালিন মোল্লা-মৌলবি-পাদ্রি-পুরোহিতের দল নিজেদের উদর পূর্তি করেছে। আর যেসকল ধর্মগুলি গোষ্ঠিপতি-সাগরেদদের পৃষ্ঠবল হারিয়েছে যখনই, এ সকল অসংগঠিত-সংগঠিত ধর্মেরই বিলুপ্তি ঘটেছে এ পৃথিবী থেকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দুর্বল সামরিক শক্তি কিংবা নিষ্ঠুর শাসনব্যবস্থার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের রোষের সামনে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী ও তার সাগরেদদের অবস্থান সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকতো। এ কারণে জনসাধারণকে বশে রাখার জন্য নীতি-নৈতিকতা-পরকাল-স্বর্গ-নরক ইত্যাদির

দোহাই দিয়ে ধর্ম নামক আফিম ছড়িয়ে দেয়া সুকৌশলে। ঘোষণা করা হত রাজাই হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার, প্রতিনিধি কিংবা রাজার সঙ্গে সরাসরি ঈশ্বরের যোগাযোগ আছে। রাজার সেবা করলে, মঙ্গল কামনা করলে, রাজন্যবর্গের আদেশ বিনা দ্বিধায় পালন করলে পরজন্মে অবশ্যই সুখ লাভ হবে, এমন কী স্বর্গেও গমন হতে পারে। যেমন মিশর, সুমেরীয় সাম্রাজ্যের সময় প্রতিটি নগর রাষ্ট্রের নিজস্ব এক বা একাধিক দেব-দেবী পূজিত হত এবং রাজার ধর্মই হত রাষ্ট্রধর্ম।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা যদিও পাঁচ হাজার বছরের পুরানো তবে উত্তর ও দক্ষিণ মিশরে ৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম রাজবংশীয় যুগের পত্তন হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ অব্দ পর্যন্ত এ অঞ্চলে আরো পাঁচটি রাজবংশ গড়ে ওঠে। প্রথম রাজবংশের নেতা মেনেস (Menes) থেকে শুরু করে পরবর্তী সব রাজাই নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করতেন; ধর্মমন্দির এবং রাষ্ট্রের মধ্যে অভিন্নতার কথাই প্রচার করতেন। রাজা ও তার পুরোহিতগণ আরো প্রচার করতেন, রাজা সূর্যদেবতা 'রে' (Re)-এর পুত্র। মিশরের রাজারা তখন 'ফারাও' (Pharaoh) নামে পরিচিত হতেন। মিশরীয় 'Per-O' থেকে এই নামের উৎপত্তি, যার অর্থ—রাজকীয় বাড়ি। ধারণা করা হয়, রাজারা প্রকাণ্ড সব প্রাসাদে বাস করতেন এবং প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ছিলেন বলেই এরকম নামকরণ করা হয়েছিল। যা হোক, মিশরে রাজবংশীয় যুগে প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্যদেবতা 'রে'। কিন্তু একসময় সূর্যদেবতার নাম পরিবর্তীত হয়ে পরিচিত হন 'আমন' বা 'আমন রে' নামে। প্রাকৃতিক শক্তির দেবতা এবং নীল নদের দেবতা হিসেবে পূজিত হতেন ওসিরিস (Osiris)। শোনা যায়, ওসিরিসের স্ত্রী ছিলেন তারই বোন আইসিস (Isis)।

খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০-২৩০০ অব্দে আক্কাদীয় নামের এক সেমেটিক ভাষী (আক্কাদ নামক অঞ্চলে) জনবসতি গড়ে তোলে। বলা হয়ে থাকে, সেমেটিক জনগোষ্ঠির মধ্যে এরাই সর্বপ্রাচীন। এদের রাজা সার্গন (২৩৭০-২৩১৫ খ্রিস্টপূর্ব) রাজ্যভিষেকের পরপরই দেবতা হিসেবে গণ্য হতেন। এ সময় মন্দিরগুলো রাষ্ট্রের বাহু হিসেবে বিবেচিত হত। সুমেরীয় সভ্যতা (৩৯০০-৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব) সম্পর্কে জানা যায়, নগর ভিত্তিক কিংবা গোষ্ঠিভিত্তিক জীবন ধারা থেকে রাজাতন্ত্রের দিকে উত্তরণের সময় ধর্মের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। তাদের ধর্ম ছিল বহু দেবদেবী নির্ভর। প্রধান প্রধান দেবতাদের মধ্যে ছিলেন, সূর্য দেবতা শামাশ, বৃষ্টি-বন্যা-বাতাদের দেবতা এনলিল, পানির দেবতা এনকি, প্রেম ও উর্বরতার দেবী ইনাননা (পরবর্তীতে ইস্টার নামে পরিচিত), প্লেগরোগের দেবতা নারগল প্রভৃতি। এসকল দেবদেবীদের রাষ্ট্রিয়ভাবে পূজা-অর্চনা করা হত। আর সে কাজ করতেন সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী পুরোহিত-রাজা "পাতেজি"। ব্যবিলনীয় সভ্যতায় স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত সম্রাট হাম্মুরাবির (আনুমানিক ১৭৯২-১৭৫০ খ্রিস্টপূর্ব) সময়কাল। সম্রাট হাম্মুরাবিকে পৃথিবীর প্রথম আইন গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে ধরা হয়; যদিও তিনি সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গির আইনকে গ্রহণ এবং সংস্কারের মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট কাঠামো প্রদান করেন। সম্রাট নিজেকে ঈশ্বরের সূত মনে করতেন। তার রাজ্যে প্রধান দেবতা সূর্যদেবতা "মারডক", প্রচলিত ছিল—সূর্যদেবতার হাত থেকেই তিনি এই আইনগ্রন্থটি পেয়েছিলেন। এছাড়া আরো কিছু দেবদেবী রাষ্ট্রের চোখে খুবই সম্মানিত ছিলেন, যেমন—মাতৃদেবী ইস্টার (গাছপালা, পশুপাখি ও মানুষের জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী), দেবতা তাম্মাজ (ইস্টারদেবীর ভাই, শস্যের দেবতা), প্লেগরোগের দেবতা নারগল, ভয়ঙ্কর অপদেবতা হর্ডস প্রমুখ। পারস্য সভ্যতার (৫৩৯-৩৩০ খ্রিস্টপূর্ব) সম্রাট কাইরাস (মৃত ৫২৯ খ্রিস্টপূর্ব)-এর সময়ই মূলত সাম্রাজ্যটি বিস্তার লাভ করে, এবং সম্রাট তৃতীয় দারিয়ুস (৩৩৬-৩৩০ খ্রিস্টপূর্ব) মৃত্যুর পরই সাম্রাজ্যটি চূড়ান্তভাবে ভেঙে পড়ে। পরবর্তীতে আবার সাসানীয় বংশ পুনরায় (খ্রিস্টপূর্ব ২২৬-৬৫১ খ্রিস্টাব্দ) পারস্য সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটায়। এসময় প্রধান রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষিত হয় জরথুস্ত্রবাদ (Zarathustrianism), কিন্তু সাসানীয় যুগেই ধীরে ধীরে জরথুস্ত্রবাদ তার মূল অবস্থান থেকে সরে আসতে থাকে, সেখানে প্রবেশ করে নানা বিকৃতি। যাহোক, যদিও অনেক আগে থেকেই, বলা যায় প্রথম থেকেই পারস্য সভ্যতায় জরথুস্ত্রবাদ ব্যাপক আকারে প্রচলিত ছিল। এই জরথুস্ত্রবাদের প্রধান দেবতা আহুরামাজাদা (আলো ও জ্ঞানের দেবতা) এবং পবিত্র কিতাব "আবেস্তা"। পাশাপাশি সেসময় আলোর দেবতা মিথ্র (Mithra), পানি ও চাঁদের দেবী আনহিতা (Anhita)-ও জনসাধারণের মাঝে পূজিত হতেন। গ্রিক সভ্যতায় মূলত খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে গোত্রভিত্তিক (Clan) বা গোষ্ঠিভিত্তিক গ্রামসম্প্রদায়গুলো ভেঙে গিয়ে নগর বা আরো বৃহত্তর রাজনৈতিক একক গড়ে উঠতে থাকে।

সেসময় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের নিজস্ব সব দেবদেবী থাকতেন, তাদেরকে বিশেষভাবে পূজা অর্চনা করা হত; যেমন অলিম্পিয়ার বিশেষ দেবতা জিউস, স্পার্টা নগরের বিশেষ দেবতা আর্টেমিস, এথেন্সের দেবী অ্যাথিনা ইত্যাদি।

চীনে হান রাজত্বকালে (২০৬-২২০ খ্রিস্টাব্দ) কনফুসিয়াসের (৫৫১-৪৭৯ খ্রিস্টপূর্ব) দর্শনকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়, সুই রাজত্বকালে (৫৮১-৬১৮) বৌদ্ধধর্ম কনফুসিয়াসের স্থলাভিষিক্ত হয় কিন্তু দশম শতাব্দীতে আবার নব্য কনফুসিয়াসবাদ ফিরে আসে। রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বপুরুষ ইট্রুস্কানদের (খ্রিস্টপূর্ব একহাজার অব্দের দিকে) মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান দেবতা ছিলেন আকাশদেবতা টিনিয়া (Tinia), গ্রিকদেবতা জিউসের সমকক্ষ হিসেবে দেখা হয়, অন্য দেবতাদের মধ্যে ছিলেন ইউনি (Uni) এবং দেবী মিনার্ভা (Menarva)। আরো অনেকেই ছিলেন, কিন্তু সেগুলো সরাসরি গ্রিক ঐতিহ্য থেকে এখানে চলে আসেন। পরবর্তীতে রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটে এবং প্রজাতান্ত্রিক রোম গড়ে উঠলেও সম্রাটকে পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস বা প্রধান পুরোহিত বলা হত। সম্রাটগণ দেবতার ছদ্মাবরণে পূজিত হতেন। সেসময় রোমান ধর্ম, অর্থাৎ সম্রাটের ধর্মই ছিল রাষ্ট্রের ধর্ম। সম্রাট দেবতা হিসেবে মরণোত্তর স্বীকৃতি পেতেন। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য হিসেবে ধরা হত সম্রাটের প্রতি আনুগত্য, সম্রাটের পূজা-অর্চনার প্রতি আনুগত্য; অন্যথা শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। এসময় ইহুদি-খ্রিস্টানধর্মাবলম্বী সাধারণ প্রজারা প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার হতেন সম্রাটের দ্বারা। কারণ, সেসময় ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মে রাজাকে উপাসনা করার রীতি প্রচলিত ছিল না। নিরীহ প্রজার উপরে অমানুষিক নির্যাতনের ফলে মাঝে মাঝে রোমান সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিত, যা সবসময় সামাল দেয়াও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে ৩১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্টাইনটাইন খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রিয় স্বীকৃতি প্রদান করেন। তারপর ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে এই ধর্মকে রোমক সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাষ্ট্রধর্ম রূপে চাপিয়ে দেয়া হয়। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সেনাবাহিনী, চাকুরি, যাজকত্ব, এবং আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়। এভাবেই রাষ্ট্রধর্ম ধীরে ধীরে গোটা রোমান সাম্রাজ্যে চেপে বসে, ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপে। আর চোরে চোরে মাসতুতো ভাইয়ের মত খ্রিস্টধর্মের পুরোহিত আর রাজন্যবর্গ মিলে দেশ শাসন শুরু করেন। কিন্তু একসময় খ্রিস্টধর্মের পুরোহিতরা দাবি করতে শুরু করেন, তারা যিশুখ্রিস্টের মর্ত্যের প্রতিনিধি। তাই চার্চের ব্যাপারে রাজার কর্তৃত্ব তাদের মানা সম্ভব নয়। তারা বলতে লাগলেন রাজার রাজত্ব নির্ভর করবে পোপের খুশির উপর; এমন কী তাদের অধিকার রয়েছে, প্রয়োজন হলে রাজার ওপরেও ছড়ি ঘুরাবার। ফলে একসময়কার জানি দোস্ত রাজাদের সাথেই শুরু হয়, রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পোপদের দ্বন্দ্ব। আর এর পরিণতি তো আমরা সবাই কম বেশি জানি। সে আরেক ইতিহাস; এখানে আজ আর নয়।

রাষ্ট্রধর্ম : দেশে দেশে :- পৃথিবীতে বর্তমানকালের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষিত দেশের তালিকা দেখে নিই, আমাদের তালিকায় প্রথমে রয়েছে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী দেশগুলো। পাঠক, আপনারা জানেন পৃথিবীর অন্যান্য আন্তর্জাতিক ধর্মের মতো খ্রিস্টধর্ম বেশ কিছু সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ে (Sect) বিভক্ত, যেমন—রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, অর্থোডক্স (ইস্টার্ন, ওরিয়েন্টাল) ইত্যাদি; এছাড়াও কিছু দেশ মধ্যযুগের মত এখনো চার্চের অধীনে আছে। যা হোক, সরকারি ধর্ম হিসেবে রোমান ক্যাথলিসিজম বারটি দেশে স্বীকৃত, যেমন—(১) আর্জেন্টিনা (২) অ্যান্ডোরা (৩) বলিভিয়া (৪) কোস্টারিকা (৫) এল সালভেদর (৬) লিখ্‌টেনস্টেইন (৭) মাল্টা (৮) মনাকো (৯) প্যারাগুয়ে (১০) পেরু (১১) সুইজারল্যান্ডের কিছু উপবিভাগ (Canton) (১২) ভ্যাটিকেন সিটি। ইস্টার্ন অর্থোডক্সকে স্বীকৃতি দিয়েছে চারটি দেশ, যেমন—(১) সাইপ্রাস (২) ফিনল্যান্ড (পাশাপাশি ইভাঞ্জেলিক্যাল লুথেরান চার্চ স্বীকৃত) (৩) গ্রীস (৪) রোমানিয়া। ওরিয়েন্টাল অর্থোডক্সকে স্বীকৃতি দিয়েছে একটি দেশ, আর্মেনিয়া। লুথেরান চার্চ রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত চারটি দেশে, যেমন—(১) ডেনমার্ক (২) আইসল্যান্ড (৩) নরওয়ে (৪) ফিনল্যান্ড। চার্চ অব ইংল্যান্ড রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত একটি দেশে, ইংল্যান্ড। রিফর্মড চার্চ হিসেবে স্বীকৃত দুটি দেশ (১) স্কটল্যান্ড (চার্চ অব স্কটকল্যান্ড), (২) সুইজারল্যান্ডের কিছু ক্যান্টন।

যে সকল দেশ রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে ঘোষণা করেছে (তিনটি দেশ নির্দিষ্টভাবে সুন্নিপন্থী ইসলাম হিসেবে এবং একটি শিয়াপন্থী ইসলাম ঘোষণা করেছে। বাকী দেশগুলো ইসলামের কোনো উপবিভাগ বা sect-এ নিজেদের বিভক্ত করেনি) তা হলো : (১) আফগানিস্তান (২) আলজেরিয়া (সুন্নিপন্থী) (৩) বাহরাইন (৪) বাংলাদেশ (৫) ব্রুনেই (৬)

কমোরস (৭) ইন্দোনেশিয়া (৮) ইরান (শিয়াপন্থী) (৯) ইরাক (১০) জর্ডান (১১) কুয়েত (১২) লিবিয়া (১৩) মালয়েশিয়া (১৪) মালদ্বীপ (১৫) মৌরিতানিয়া (১৬) মরোক্কো (১৭) ওমান (১৮) পাকিস্তান (১৯) কাতার (২০) সৌদি আরব (সুন্নিপন্থী) (২১) সুমালিয়া (সুন্নিপন্থী) (২২) তিউনিশিয়া (২৩) সংযুক্ত আরব আমিরাত (২৪) ইয়েমেন। মিশরে যদিও রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে ঘোষণা করা হয়নি তথাপি ইসলামিক শারিয়া মিশরে আইন প্রণয়নের মুখ্য ভিত্তি।

কিছুদিন আগ পর্যন্ত পৃথিবীতে একটি মাত্র হিন্দুরাষ্ট্র ছিল নেপাল। গত ২০০৬ সালের মে মাসে নেপালি সংসদ তাদের দেশকে সেক্যুলার রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে।

ছয়টি দেশে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্ম স্বীকৃত : (১) ভুটান (২) কম্বোডিয়া (৩) থাইল্যান্ড (৪) মায়ানমার (৫) তিব্বত (৬) শ্রীলঙ্কা।

প্রচলিত আছে, রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইহুদিধর্ম একমাত্র ইসরাইলেই, কিন্তু সত্য হচ্ছে সরকারিভাবে ইসরাইলে রাষ্ট্রধর্ম এখন পর্যন্ত ঘোষিত হয়নি।

Pluralist বা বহুত্ববাদী ধর্মের দেশ হচ্ছে ভারত এবং লেবানন। উল্লেখ্য লেবাননের ১৮টি রাষ্ট্রধর্ম রয়েছে। এর মধ্যে খ্রিস্টধর্ম (রোমান ক্যাথলিক, গ্রিক অর্থোডক্স, গ্রিক ক্যাথলিক, ম্যারোনাইট, আর্মেনিয়ান ক্যাথলিক, আর্মেনিয়ান অর্থোডক্স, ইভাঞ্জেলিক্যাল ইত্যাদি), ইসলাম (সুন্নি, শিয়া, দ্রুজ, ইসলাইলি, আলাওয়ি), ইহুদি ধর্ম ইত্যাদি।

কিছু রাষ্ট্র সরকারিভাবে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা দিতে রাজি নয়, এদেরকে আমরা সেক্যুলার রাষ্ট্র বলে থাকি। রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে—(১) অস্ট্রেলিয়া (২) আজারবাইজান (৩) আলবেনিয়া (৪) ইসরাইল (৫) ইউক্রেন (৬) কানাডা (৭) কিউবা (৮) চিলি (৯) জাপান (১০) তুরস্ক (১১) দক্ষিণ আফ্রিকা (১২) দক্ষিণ কোরিয়া (১৩) নিউজিল্যান্ড (১৪) নেপাল (১৫) পর্তুগাল (১৬) ফিলিপিন্স (১৭) ফ্রান্স (১৮) বসনিয়া ও হার্জিগোভিনা (১৯) ভারত (২০) মলদোভা (২১) মেক্সিকো (২২) যুক্তরাষ্ট্র (২৩) রোমানিয়া (২৪) লাটভিয়া (২৫) সিঙ্গাপুর (২৬) স্লোভাকিয়া (২৭) স্লোভানিয়া ইত্যাদি।

সেক্যুলার রাষ্ট্র : যেমন আছে, যেমন হওয়া উচিৎ :- ইংরেজি "Secularism" শব্দটি নিয়ে আমাদের মধ্যে (বিশেষ করে এ উপমহাদেশে) বেশ দ্বন্দ-বিভেদ রয়েছে। ঐ ইংরেজি শব্দের অর্থ "ধর্মনিরপেক্ষতা"—এমনটি আমরা প্রায়শঃই ব্যবহার করে থাকি। কেউ কেউ সেক্যুলারিজম শব্দের অর্থ হিসেবে—ইহজাগতিকতা বুঝিয়ে থাকেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছেও এটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কিন্তু এখানে আলোচনা খাতিরে বহুল প্রচারিত "ধর্মনিরপেক্ষতা" শব্দটিই রাখছি। প্রচলিত ধারায়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে আমরা বুঝি যে রাষ্ট্র সব ধর্মের সমান অধিকার দিবে, উৎসাহ দিবে, সমান সুযোগ দিবে, আর্থিক সুবিধা দিবে, কারো প্রতি বৈষম্য চলবে না। এমন কী আমাদের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধানে এমনটিই বুঝানো হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর, গণপরিষদের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তাতে (বাংলাদেশের সংবিধানে) বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা আইন করে ধর্মকে নিষিদ্ধ করতে চাই না এবং করব না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের বাধা দেবার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নেই। হিন্দুরা তদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে বেঈমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেছি।" (সংগৃহীত—বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঈদ সংখ্যা ২০০৭, সাপ্তাহিক ২০০০, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৭, বর্ষ ১০, সংখ্যা ১৯, শাহরিয়ার কবির,

বাংলাদেশে মৌলবাদ বনাম ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতা, পৃষ্ঠা ২০০।) পাশাপাশি এটাও দেখেছি, কোন শব্দ একবার কোন কারণে জনপ্রিয় বা প্রচলিত হয়ে গেলে, তা গণচেতনার গভীরে স্থান পেয়ে যায়, তাঁর অর্থ তখন সঠিক কী ভুল, তা তেমন খোঁজে দেখা হয় না। শব্দের অর্থ ভুল হলেও, সঠিক শব্দটি আর সহজে জনমনে স্থান পায় না। কিন্তু সেক্যুলারিজম নিয়ে আমাদেরকে যা জানানো হয়েছে, আসলে সেক্যুলারিজম শব্দটির অর্থ আদিতেও এমন ছিল না, এখনও নেই। স্বীকার করতে হবে, আমাদেরকে এক্ষেত্রে ভুল বুঝানো হয়েছিল। সেক্যুলারিজম শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, যা ধর্মবিমুখ (কিংবা ধর্মের প্রতি উদাসীন) এবং জগতমুখী। ইংরেজি "Religious" বা ধর্মীয় শব্দটির বিপরীতার্থক হিসেবে "সেক্যুলার" শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। "ধর্মীয়" শব্দটির বিপরীত অর্থ নিশ্চয়ই—"সর্বধর্মসমভাব", "সর্বধর্মসহনশীল", "সর্বধর্মরক্ষা" কিংবা "সর্বধর্মসমন্বয়" হতে পারে না; হবে "ধর্মহীনতা" বা "ধর্মের প্রতি উদাসীনতা"। এই অর্থেই প্রাচীন ভারতের লোকায়ত বা চার্বাকবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, এবং এই অর্থেই আঠারো শতকে ইউরোপের জ্ঞানবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারার ভিত্তিও ছিল তাই। (পাঠক খেয়াল করবেন, আমি এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির বিভিন্নজনের ব্যক্তিগত সংজ্ঞা ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটিই উল্লেখ করছি শুধু, আমাদের দেশে বা এ অঞ্চলে কে-কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে গ্রহণ করে থাকেন, তা বিবেচ্য বিষয় নয়।) তাছাড়া এটাও সত্য, সমাজে একটি শব্দের ভুল ব্যাখ্যা প্রচলিত থাকলে (কিংবা গোঁজামিল থাকলে), এবং তা অনুসরণ করতে গেলে—এক সময় না এক সময় গতিপথও ভুল হতে বাধ্য।

অনেকে বলে থাকেন, ধর্মের প্রতি যে কোনো উদার মনোভাবকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলা যায়। এটাও ভুল ধারণা। এ প্রসঙ্গে আমি ভারতের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গ্রন্থ থেকে দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি, তিনি বলেন—"ধরা যাক, কোনো ব্যক্তিমানুষ নিজ ধর্মে সম্পূর্ণ আসক্ত এবং সে ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করেন। কিন্তু তিনি অপর ধর্মের অস্তিত্ব সহ্য করে নিতে রাজি আছেন। সেসব পরধর্মের মানুষের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল নন, কিন্তু সহনশীল। ব্যক্তি বা অথবা রাষ্ট্রের জীবনে এ ধরনের ধর্মনীতির নাম ক্যাথলিসিজম (Catholicism) বা কসমোপলিটানিজম (Cosmopolitanism), অর্থাৎ সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন সহনশীলতা। কিন্তু এ ধরনের মনোভাব বা নীতিকে ধর্মের প্রতি উদাসীনতা (বা হীনতা) অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা আখ্যা দেয়া যায় না। দ্বিতীয় উদাহরণ, কোনো ব্যক্তিমানুষ নিজ ধর্মের প্রতি আসক্ত এবং একনিষ্ঠ। তিনি নিজ ধর্মকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করেন। কিন্তু একই সঙ্গে মানতে রাজি আছেন যে অন্য ধর্মের মধ্যেও কিছু সত্য নিহিত আছে। যদিও সেসব ধর্ম তার নিজের ধর্মের চেয়ে হীনতর। আর দেশ-কাল অনুযায়ী সেসব ধর্মও মানুষকে অন্তত কিছুটা ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই অর্থেই যতো মত, ততো পথ। এ তত্ত্ব বা নীতিকে এক্লেক্টিসিসম (Eclecticism) বা সর্বধর্মসমভাব বলা যেতে পারে, কিন্তু এটিকেও ঐ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বলা সম্ভব নয়।" এখন আমরা বলতে পারি, ধর্মহীনতা বা ধর্মের প্রতি উদাসীনতার প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রিয় নীতি নির্ধারিত হলে, তবেই সেই রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। নতুবা নয়। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শুধু যে রাষ্ট্রধর্ম থাকবে না, তা নয়—রাষ্ট্রের সমস্ত নীতি (রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি) নির্ধারণ ও রূপায়নে সব রকমের ধর্ম ও ধর্মচিন্তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। মনে রাখা উচিত, ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি—যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিশ্বমানবতা। ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেককেই দেখছি, যারা নিজেদেরকে সেক্যুলার পরিচয় দিতে পছন্দ করেন অথবা গর্ববোধ করেন, কিন্তু তাঁদের কাছে, সেক্যুলার শব্দের অর্থ, সেই ক্যাথলিক, কসমোপলিটান কিংবা এক্লেক্টিস—ধরনের; হয়তোবা না-জানার কারণে এমন ধারণা তৈরি হয়েছে, অথবা ধর্মহীনতার প্রতি শুচিবায়ু স্বভাবের কারণেও এমন ধারণা পোষণ করে থাকেন। আবার লক্ষ্য করা যায়, এখনো কিছু কিছু রাষ্ট্রও সংবিধানিকভাবে সেক্যুলাররাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত, কিন্তু রাষ্ট্রনীতির মধ্যে ধর্মের ছোঁয়া রয়ে গেছে, ধর্মের প্রতি এক ধরনের উৎসাহ দেয়া হয়েছে কিংবা ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ঘোষিত হয়েছে; যেমন ভারত, বাংলাদেশ (জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনকালে কথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাতিল করার আগ পর্যন্ত সংবিধান এমনটিই ছিল)। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন ভারতের সংবিধানে সরাসরি ধর্মনিরপেক্ষ নীতির কোনো উল্লেখ ছিল না। ১৯৭৬ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে (জরুরি অবস্থা চলাকালে) সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের মুখবন্ধে সর্বপ্রথম

ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হয় (আর ১৯৭৮ সালে পাশের দেশ, বাংলাদেশের সামরিক শাসকেরা সংবিধানে ১৫তম সংশোধনী নিয়ে এসে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে গিলে খেয়ে ফেলেছে)। কিন্তু অনেক আগে রচিত ভারতীয় সংবিধানের ১৫তম ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না (বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(১)তম ধারায়ও এ বিষয়টি আছে, বলা আছে– "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।")। এ থেকে অনেকের মনে হতে পারে, ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এ ধারাতেই নিহিত আছে। আবার ২৫(১) ধারায় বলা হয়েছে, সব মানুষই নিজ নিজ ধর্ম ঘোষণা, আচরণ এবং প্রচারের সমান অধিকার আছে। ২৬(১) ধারায় আরো বলা হয়েছে, প্রত্যেক নামাঙ্কিত ধর্ম বা ধর্মগোষ্ঠির অধিকার আছে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবার, নিজেদের সমস্ত ধর্মীয় ব্যাপারে নিজে ব্যবস্থাপনা করবার আর ধর্মীয় প্রয়োজনে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ক্রয়, গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা করবার (উপরোক্ত দুটি ধারার সঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানের ৪১(১)নং ধারা প্রায় হুবুহু মিলে যায়)। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় সংবিধানে সব ধর্ম-ধর্মগোষ্ঠী এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বলিষ্ঠ স্বীকৃতি এবং উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বলতে পারি, সব ধর্মের মানুষকেই নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আসক্ত থেকে তার নিজ ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সংবাধানিকভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এহেন ধর্মনীতি অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত সংজ্ঞার পরিপন্থী। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি-আচরণ রোধের জন্য ভারতীয় সংবিধানের ১৪ এবং ১৫নং ধারা যথেষ্ঠ (যেমন বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮নং ধারা)। কারণ, ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নং ধারায় উল্লেখ আছে, আইনের দৃষ্টিতে সকলেরই সমান অধিকার। এর সঙ্গে যদি ১৫ নং ধারা যোগ করা হয়, তবে দেখা যায়—ধর্মের কারণে কারো প্রতি বৈষম্যের আর কোনো অবকাশ থাকে না। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ নং ধারায় উল্লেখ আছে—"সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।" বাংলাদেশের সংবিধানে যেহেতু প্রায় তিন দশক আগেই ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাতিল করা হয়েছে, তাই বাংলাদেশের সংবিধান রচয়িতাদের ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্দেশ্য-কৌশল-বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ বাদ দিলাম। কিন্তু উপরে আলোচিত অন্যান্য ধারা থেকে স্পষ্টই মনে হয়, ভারতের সংবিধান রচয়িতারা সব ধর্মকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দিতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—"সব ধর্মের মানুষ গভীরভাবে ধার্মিক হবে, নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আসক্ত থাকবে, আর তারপর বিধর্মীদের প্রতি সহনশীল হবে, এই ছিল সংবিধান রচয়িতাদের মূল ভাবনা। রাষ্ট্রও জনগণের ধর্মাশক্তিকে উৎসাহিত করবে, কিন্তু কোনও ধর্মের মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না, এই ছিল সাংবিধানভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি।" বাহ্যিকভাবে এ ধরনের বক্তব্য শুনতে ভালো লাগলেও বাস্তবতা ভিন্ন। রাষ্ট্রিয়ভাবে সব ধর্মকে সমান উৎসাহ, সুযোগ দেবার নীতি অনুসরণ করলে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ধর্মের নিরখে জনসাধারণের মধ্যে ক্রমাগত বিভক্তি বেড়ে চলে। জনসাধারণের মধ্যে অন্যান্য শ্রেণিবিভক্তির (অর্থ-বিত্ত-বর্ণ-আঞ্চলিকতা-লিঙ্গ ইত্যাদি) মতো ধর্মও একটি শ্রেণিবিভক্তির পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। ভারত-বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থাও তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রিয় উদ্যোগে এবং নির্দেশে এরকম বিভাজন সৃষ্টি করার নীতি যে কোনো প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের যুক্তিবিরুদ্ধ এবং অসংগত। তাছাড়া রাষ্ট্রিয়ভাবে সব ধর্মকে সমান উৎসাহ-সুযোগ দেবার নীতি থাকলেও, কখনোই সকল ধর্মকে সমান সুযোগ দেয়া যায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু ধর্মানুসারিদের মধ্যে যারাই সরকার ব্যবস্থায় থাকে, তারাই ধর্মীয় পরিচয়ে ক্ষমতা-সুযোগ-সুবিধা বেশি ভোগ করে থাকে। আর যে ধর্মানুসারিরা সরকার ব্যবস্থায় থাকে না, তাদের মধ্যে আস্তে আস্তে রাষ্ট্রের প্রতি বিচ্ছিন্নতাবোধ, অসন্তোষ, ক্ষোভ তৈরি হয়; রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে বিভক্তির মধ্যে ঠেলে দেয়। এটা ব্যবহারিকভাবে সত্য। এছাড়া এ অঞ্চলে (ভারত ও বাংলাদেশে) আইন ব্যবস্থায়ও ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকদের বিভাজনের নীতি বলবৎ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, নারীর অধিকার ইত্যাদি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়ে হিন্দু জনগোষ্ঠির জন্য এরকম, মুসলিম জনগোষ্ঠির জন্য একরকম—ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রচলিত আছে। আর আইনের উৎস হচ্ছে, ঐ সকল ধর্মের স্ব-স্ব ধর্মীয় শাস্ত্র, শাস্ত্রকারদের ব্যাখ্যা-মতামত ইত্যাদি। এখানে ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন আইনের ক্ষেত্র সীমিত। কিন্তু প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আইনব্যবস্থা আংশিকভাবেও ধর্মশাস্ত্রের বিধিবিধান বা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠিকেন্দ্রিক হতে পারে না। অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রিয় নীতি এবং আইন কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট—ধর্মনিরপেক্ষ

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এমনটি নয়। তাহলে আমরা বলতে পারি, ভারত যেমন বর্তমানে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়, তেমনি বাংলাদেশও স্বাধীনতার পর প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল না। শুধু নামকাওয়াস্তে "ধর্মনিরপেক্ষতা"-র লেবেল সেঁটে দেয়া হয়েছিল। আবার রাজনীতিতে ধর্ম ব্যবহারের সুযোগ থাকলে, অবশ্যই রাষ্ট্রিয় নীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটবে (ঘটেছেও সেটা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানে); এবং ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মই সেই সুযোগ বেশি পায় সাধারণত। ফলে সেটা হবে ধর্মনিরপেক্ষতার হানি আর আস্তে আস্তে কোনো না কোনো ধরনের ধর্মরাষ্ট্রের দিকে যাত্রাপথের সূচনা। ভারতের বি জে পি-শিবসেনা, বাংলাদেশের জামাতে ইসলামিসহ অন্যান্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি ও তাদের কর্মকাণ্ড এ ব্যাপারে জ্বলন্ত উদাহরণ। আজকের এ উপমহাদেশে এতো ভয়াবহ রকমের সাম্প্রদায়িক হানাহানি-খুনোখুনির দায় তাই কোনোভাবেই এ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো এড়িয়ে যেতে পারে না। এখন কেউ হয়তো বলতে পারেন, সেক্যুলার রাষ্ট্রে সবাইকে কী নাস্তিক বা ধর্মহীন হয়ে বাস করতে হবে? আমি বলব, মোটেই তা না; কেউ যদি ধর্মবাদী হতে চায়, হবে; কেউ যদি নাস্তিক হতে চায়, তাও হবে। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দিতে হবে। ব্যক্তি যেমন এখন কিছু-কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে তার জীবনসঙ্গী খোঁজে নিতে পারে, নিজের জীবনের লক্ষ্য নিজেই তৈরি করতে পারে (রাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করে না), তেমনি সেক্যুলার রাষ্ট্রেও ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজের যে কোনো ধর্মীয় পরিচয় কিংবা নাস্তিকতা খোঁজে নিবে; এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। আমি শুধু স্পষ্ট করে বলতে চাচ্ছি, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে হলে অবশ্যই ধর্মকে রাষ্ট্রিয় পর্যায় (নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন) থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নামিয়ে দিতে হবে। সেক্যুলার রাষ্ট্রে কেউ যদি ধর্মবিশ্বাস লালন, ধর্মচর্চা, ধর্মপ্রচার করতে চায় তবে তা করতে পারবে, কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে-ক্ষমতায়। পাশাপাশি কেউ যদি নাস্তিকতার চর্চা এবং প্রচার করতে চায়, সেটাও করতে পারবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে-ক্ষমতায়। রাষ্ট্র কারো ধর্ম চর্চায় সুবিধা-উৎসাহ কিংবা নিষেধাজ্ঞা দিবে না, ঘটা করে যেমন কোনো ধর্মানুষ্ঠান পালন করবে না, তেমনি রাষ্ট্রিয় নীতিতে ধর্মকে উৎসাহ-সুযোগ-সুবিধা দেবার রীতি থাকবে না। রাষ্ট্রিয় নীতি এবং তার আইন-রাজনীতি হবে সর্বজনীন, কোনো গোষ্ঠির প্রতিনিধিত্বকারী নয়। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবেই ধর্মের শেকল হতে মুক্ত হয়ে রাষ্ট্র ও রাজনীতি হবে বিজ্ঞান, যুক্তি ও মানবতার আদর্শে।

রাষ্ট্রধর্ম : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ :- ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের প্রধান চারটি মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি হয়েছিল নিষিদ্ধ। যদিও সংবিধানের এই মূলনীতি নিয়ে নানা জনের মত। ধর্মনিরপেক্ষতার যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল, তা কারো কারো কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ তা ধর্মনিরপেক্ষতার মূল অর্থকে বিকৃত করেছিল। সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রকে আলাদা করে দেয়ায় বাংলাদেশের এক দ্রোহী বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন—"এভাবে আলাদা করে দেয়ার মানে কি? তারমানে সংবিধানরচয়িতারা আমাদের বুঝাতে চাচ্ছেন, সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র নেই। কিংবা গণতন্ত্রে সমাজতন্ত্র নেই। কিন্তু আমরা জানি সমাজতন্ত্রে অবশ্যই গণতন্ত্র রয়েছে এবং গণতন্ত্র কখনোই পরিপূর্ণতা পায় না সমাজতন্ত্র ছাড়া।" বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কতিপয় দক্ষিণমুখো ব্যক্তিবর্গ। যাহোক, এই সংবিধান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কতিপয় রাজকার-পাকবাহিনীর দালালসহ আরো কিছু বিভিন্ন মতের ব্যক্তিবর্গ বাদে অধিকাংশ বাঙালি জনগণের কাছেই গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার পট পরিবর্তন হলে ১৯৭৮ সালে তৎকালিন সামারিক শাসনের প্রতিভূ জিয়ার সরকার সংবিধানে ১৫তম সংশোধনী নিয়ে এসে উল্লেখিত চারটি মূলনীতির মধ্যে প্রথমেই খারিজ করে দেন ধর্মনিরপেক্ষতা—প্রস্তাবনাতে যুক্ত হয় বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে), মূলনীতিতে আসে সর্ব-শক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরবর্তীতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রকে পাল্টিয়ে—অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারমূলক সমাজতন্ত্র বানানো হয় (এটা আবার কোন চিজ—খায় না মাথায় দেয়!)। তুলে দেয়া হয় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থাকা নিষেধাজ্ঞা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালে আরেক সামরিক শাসক, (পটুয়া কামরুল হাসানের ভাষায়) বিশ্ববেহায়া হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ষোল কলা পূর্ণ করে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন ইসলাম। পাশে এও সংযুক্ত করা হয়—"তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।" এখানে

বিশেষভাবে "শান্তিতে পালন করা যাইবে" নামক শব্দ দেখে বেশ হাসি পায়, গরু মেরে জুতা দান করা হচ্ছে! জানি না, এরশাদের সাহেবের এই রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার ফলে মহান আল্লাহতায়ালা খুশি হয়েছেন কি-না, এও জানি না এরশাদ সাহেবের নেকি কত গুণ বেড়েছে, পুলসিরাত পাড় হতে আর কত নেকি বাকি আছে, কিন্তু এটা আন্দাজ করতে পারি, এর ফলেই (বাংলার মানুষের ধর্মানুভূতিতে সুড়সুড়ি দিয়ে) এরশাদের রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছে। নয়তো তাঁর মত বিশ্ববেহায়ার রাজনীতিতে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়তো। আর এটাও বুঝতে পারি, এই ঘোষণার দ্বারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সাংবিধানিকভাবে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে দেয়া হল। একটা জিনিষ খটকা লাগছে, সংবিধানের প্রথম ভাগের প্রথমেই এখনো প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা রয়েছে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ"। আমার কাছে, কেন জানি রাষ্ট্রধর্মের সাথে "গণপ্রজাতন্ত্রী" শব্দটি খাপ খায় না। অনুরোধ এরশাদ সাহেবের কাছে, ভবিষ্যতে যদি আবার কখনো ক্ষমতায় আসেন, তবে কাইন্ডলি বাংলাদেশের আগে বসানো ঐ গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দটি বাদ দিয়ে দিবেন। তবেই ঝাক্কাস হবে!

এখনো কিছু কিছু বামপন্থী রাজনৈতিক দলসহ কেউ কেউ আবার বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাবার কথা বলেন; আমাদেরকে আশার কথা শোনান। শুনতে ভালো লাগে (আমি বলি কী, বাহাত্তরের সংবিধানেরও সংশোধনের প্রয়োজন আছে, আর কোন ছদ্মবেশধারী ব্যাখ্যা চাই না; চাইলে সঠিকটাই চাই।)। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা কিংবা সংবিধানের ধর্মীয়করণের ফলে সাম্প্রদায়িক বিভাজন এত দিনে এতই বেড়ে গেছে, যে আগামী বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে এরকমটি ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং দিনদিন ধর্মভিত্তিক দলগুলো আরো ফুলে-ফেঁপে ওঠবে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যে ক্ষোভ-ক্রোধ-বিদ্বেষ-অসহিষ্ণুতা আরো বৃদ্ধি পাবে। আর এগুলি বৃদ্ধি পেলে ফলাফল কী হতে পারে, তা বুঝতে জ্যোতিষি হবার প্রয়োজন নেই। উদাহরণ চোখের সামনেই আছে।

তথ্য সহায়তা :

(১) ভবানীপ্রসাদ সাহু, ধর্মের উৎস সন্ধানে, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

(২) মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ধর্ম ও রাষ্ট্রধর্ম, দৈনিক প্রথম আলো (২০ অক্টোবর ২০০৬, ঈদ সংখ্যা), ঢাকা।

(৩) এ কে এম শাহনাওয়াজ, বিশ্বসভ্যতা (প্রাচীন যুগ), প্রতীক প্রকাশন সংস্থা, ঢাকা।

(৪) http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_state-established_religions

(৫) জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণতন্ত্র ধর্ম ও রাজনীতি, ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, হাওড়া।

(৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, (২০০০ সালের ৩১ মে পর্যন্ত সংশোধিত)।

-0-

◘ অনন্ত বিজয় দাশ : শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।